সাহিত্য পত্রিকা ॥ বাংলা বিভাগ ॥ চুয়াল্লিশ বর্ষ ॥ তৃতীয় সংখ্যা ॥ আষাঢ় ১৪০৮ ॥ জুন ২০০১ (প্রকাশকাল : জুন ২০০২)

'বিচিত চিন্তা' : বাঙালির ঐতিহাসিক প্রত্যুত্তর

সিরাজুল ইসলাম*

আহমদ শরীফের প্রথম গ্রন্থ *বিচিত চিন্তা* (১৯৬৮)।[১] আমৃত্যু যে চিন্তার উপর প্রধান্য দিয়েছেন, শিক্ষানবিশি মনোযোগে বিশ্বস্ত থেকেছেন উপযোগবাদে, প্রথা-সংস্কারের নাগপাশ ছিন্ন করে উত্তীর্ণ হতে চেয়েছেন বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদে এবং মানবতাই যেখানে শেষ কথা— তার বীজ উপ্ত হয়েছিল প্রথম গ্রন্থে। শিক্ষা ছিল তাঁর ব্রত এবং যুক্তির সুকঠিন জটিল পথে শিক্ষকের স্বাতন্ত্র্য অর্জনের অহঙ্কারে তা মূর্ত হয়েছিল। ফলে বিতর্ক তাঁর রক্তে মিশ্রিত, আক্রমণাত্মক ক্ষোভ ও দ্রোহ তাঁর স্বভাবজাত এবং অনন্যতার তৃষ্ণা তাঁর ব্যক্তিত্বের সমমান। পশ্চাৎপদের যোগসূত্র দ্রুত ছিন্ন করে অর্জিত তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রায়শ একক, অনন্যতায় নিঃসঙ্গ কিংবা গোষ্ঠীবদ্ধ জ্ঞান-স্বাতন্ত্র্য-অভিমানে। এজন্যে রাজনীতিতে তিনি চিন্তাবিদ, সংস্কৃতি-পুরোধা কিন্তু জনমনে দূরবর্তী নক্ষত্র মাত্র— বোধগম্য নিরবচ্ছিন্ন আলোর অভাবে অনাত্মীয়। তবু জ্ঞানীর রাজত্ব নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে; যে উপযোগিতার প্রশ্ন বর্তমানে মুক্তি এনে দিতো তাকে সরিয়ে দিতে হলো ভবিষ্যতের দিকে, দুর্ভাগ্য আমাদের। আহমদ শরীফের ধর্ম ও রাষ্ট্র, সমাজ ও সংস্কৃতি, ব্যক্তি ও সাহিত্য সম্পর্কে চিন্তার সংকলন হিসাবে *বিচিত চিন্তা* তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৫১ থেকে ১৯৬৭ সাল, পাকিস্তানি পর্বের সিংহভাগ; আমাদের জাতীয় জীবনের সংগ্রামী অধ্যায়গুলোর চিহ্নায়ক ছড়িয়ে আছে উক্ত কালপরিধির প্রবন্ধগুলোতে। বাঙালির সংস্কৃতিচিন্তার অন্যতম স্মারক গ্রন্থ হিসাবে বিবেচনায় এনে, লেখক যেমন বলেছেন 'শ্রেয়সের সন্ধানে ব্যাকুল ও দিশেহারা', বুঝে নিতে চাই ঐতিহ্য ও সমকাল, রাষ্ট্র, ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি।

ক. সংস্কৃতি চিন্তা

দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান নামের যে কৃত্রিম ও বিধিবিরুদ্ধ রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে উঠেছিল তা বাঙালির প্রাণে বেশি দিন স্থান পায়নি। ভাষা প্রশ্নে বাঙালির আত্ম-উচ্চারণ ও অধিকারপ্রতিষ্ঠা, সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রয়োগ, সামরিক স্বৈরাচারবিরোধী সফল আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসনের দাবি এবং অনিবার্য সংগ্রামী ঐতিহ্যে স্বাধীনতামুখী গণজাগরণ তার জাতীয়তাকেন্দ্রিক রাষ্ট্রকাঠামোর স্বকীয়তা নির্দেশক। আহমদ শরীফ প্রায় সমগ্র পাকিস্তান-পর্বে বাঙালির ঐতিহ্যকেন্দ্রিক স্বাতন্ত্র্য নির্ধারণে সচেষ্ট। জাতীয়তাবোধে যে সাংস্কৃতিক উপাদানগুলো সক্রিয় থাকে তার ভরকেন্দ্র ভাষা ও সমাজকাঠামোর ঐতিহ্যিক উত্তরাধিকার। ফলে আকস্মিক আরোপ কিংবা অনুপ্রবেশ-প্রচেষ্টা বিশৃঙ্খলাই সৃষ্টি করে,

---

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বৃহত্তর মানবমুক্তির দ্বার উন্মোচন করেনা। আহমদ শরীফ বাঙালি জাতীয়তাবাদীর সচেতনতায় তাঁর ভাষা, দেশ ও জাতি বিবেচনায় আগ্রহী। 'স্বদেশ, স্বভাষা ও স্বাজাত্য' প্রবন্ধে স্পষ্ট করে বলেছেন, বাঙালি 'দেশজ মুসলমান' এবং 'ধর্মাদর্শকে দৃঢ় করে ধরিনি আমরা।' কেননা ঐতিহ্যপ্রীতি আমাদের স্বভাব এবং তা বুদ্ধিশাসিত আদর্শবাদের চাইতে শক্তিশালী। স্বদেশ আমাদের 'জীবনবৃত্ত', 'আর ভাষা হচ্ছে জীবন-রস।' 'ধর্মান্তরে জাত্যন্তর' ঘটে এমন আকস্মিক ও বিভ্রান্তিকর মন্তব্যের পরও আহমদ শরীফ স্বভাষা ও স্বদেশ প্রশ্নে ধর্মের সঙ্গে সমঝোতায় আসেননি। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সংস্কৃতি সাধনায় বাঙালি ঐতিহ্যে তিনি বিশ্বস্ত; ধর্ম স্বাতন্ত্র্যবাদী তিনি নন।

১৯৫২ সালে প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধ 'মানুষের সাধনা' এবং 'মানববিদ্যা'; এগুলোতে বৃহত্তর মানবমুক্তির আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে।[২] মানব মূল্যায়নের নতুনতর মানদণ্ডের উপর গুরুত্ব আরোপ করে ধর্ম-সংস্কৃতির সংকীর্ণতা চিহ্নিতকরণের পাশাপাশি আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মসম্মানবোধের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 'মানুষের সাধনা' প্রবন্ধে মানব সম্পর্কের ঐতিহাসিক বিপর্যয়, পারস্পরিক অবিশ্বাস, রাষ্ট্রনৈতিক জটিলতা, ধর্মবোধের সংকীর্ণতা, সংস্কার ও অন্ধতার চোরাগলিতে অপচয়িত মানবাত্মা অবলোকনে বিচলিত আহমদ শরীফ। মানুষের যে সুমহান দায়িত্ব ও ক্ষমতা, তার অপব্যবহার, নির্বিকার চলমানতা, আত্ম-আবিষ্কারের অভাব, তার প্রেক্ষাপটে হতাশামগ্ন প্রশ্ন ধ্বনিত হয়— 'মানুষ কি চিরকাল হাস্য-সক্ষম ও মনন-সম্পন্ন জীবই থাকবে— হৃদয়বান সহানুভূতিশীল হয়ে উঠবে না?' অবশ্য একুশের সফলতার পর এ-হতাশা প্রশ্নসাপেক্ষ। আহমদ শরীফ মূলত বৃহত্তর মানবমূল্যায়নে অগ্রসর হওয়াতে একুশের প্রত্যক্ষ প্রেরণা প্রবন্ধটিতে অনুপস্থিত। 'মানববিদ্যা' প্রবন্ধের অন্তর্সত্য নির্ধারিত হয়েছে আধুনিক মানুষের আত্মমর্যাদার মানদণ্ডে, কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের নীতি কিংবা সমাজবিধির ঘূর্ণাবর্তে নয়। মুক্ত মানুষের আত্মিক শক্তিই তার সংস্কৃতি, তার ধর্ম; কোনো প্রকার পাপ-পুণ্যের শাস্তি-লোভ নয়, আত্মসম্মানে জাগ্রত মানুষই সৃষ্টি করে পৃথিবীর পথ। প্রকৃত মানুষ নিজে বাঁচা ও অন্যকে বাঁচানোর সংস্কৃতি সৃষ্টি করে। আহমদ শরীফ প্রকৃত মানুষের জন্য ধর্মের গুরুত্ব স্বীকার করেননি; তেমনি স্বীকার করেননি সমাজের প্রথা-সংস্কার। 'বিকাশের পথে মানবতা' (১৯৫৯) প্রবন্ধে আহমদ শরীফ ধর্ম, দেশ, রাষ্ট্র ও ভাষার নিরিখে মানবপরিচয়কে অস্বীকার করেছেন। মহান মনুষ্যত্বের আস্থা নিয়ে জীবন-সৌন্দর্য উপভোগের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সন্ধান করেছেন তিনি। ধর্মকে পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনা করে জীবনের পরিণাম আত্মমর্যাদাবোধে, এসত্য সকল ধর্মসংকীর্ণতা ও স্বাতন্ত্র্যবোধকে অস্বীকার করে এবং সৌন্দর্যানুগত্যই হয়ে পড়ে সংস্কৃতি ও জীবন-সাধনা। মানুষের চূড়ান্ত লক্ষ্য যেহেতু জীবনকে সৌন্দর্যে মুক্ত করা, ফলে এ-সূত্রে ধর্ম ও ভূমি স্বাতন্ত্র্য টিকে থাকে না এবং আহমদ শরীফ এভাবে সংস্কৃতি সাম্যে একক বিশ্বরাষ্ট্রের ধারণায় উপনীত হন। মার্কসীয় সাম্যবাদের রাষ্ট্রবিলোপ ধারণাটি এখানে বোধগম্য ভাষায় প্রকাশিত হলো—

> সেদিন দূরে নয়, টিকে থাকার গরজে, স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকার অভিলাষে সেদিন আঞ্চলিক শাসন সংস্থার ব্যবস্থা-ভিত্তিক গোটা দুনিয়া পরিণত হবে এক রাষ্ট্রে।

আহমদ শরীফের সংস্কৃতি-চিন্তার কেন্দ্রীয় বলয়টি সৃষ্টি হয়েছে ধর্ম ও রাষ্ট্রকাঠামো বিষয়ক আলোচনায়। এর কার্যকারণ অবশ্য পাকিস্তানি রাষ্ট্রকাঠামোর কতিপয় আরোপিত ও নির্যাতনমূলক কর্মকাণ্ডে নিহিত। বাঙালির ভাষা-প্রশ্ন শেষপর্যন্ত স্বাধিকার-প্রশ্ন ও মীমাংসায় পরিণত হয়। রক্তস্রোতে ঐতিহ্য-স্বর, যাকে বলি উত্তরাধিকার, তার পূর্বাপর অঙ্গীকার ব্যতীত ব্যক্তির অস্তিত্বও সুনির্দিষ্ট হয় না। জাতি প্রশ্নে অনিশ্চয়তা রাষ্ট্রনৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, শোষণ ও অবদমনের পথ উন্মোচন করে দেয়। আহমদ শরীফ তাই জাতি ও রাষ্ট্রকাঠামো নিয়ে অধিক সচেতন হয়েছেন। যদিও তিনি রাষ্ট্রবিলোপের ধারণায় বিশ্বাসী এবং জাতিসত্তার সঙ্গে তার বিবোধও নেই, কেননা জাতীয়তাই আন্তর্জাতিকতার ভিত্তি। তবে তিনি ধর্মস্বাতন্ত্র্যের জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী নন। ধর্মস্বাতন্ত্র্যের বৈরিতাকে তিনি মানবতার অপমান হিসাবে চিহ্নিত করে এর বিলোপের পক্ষে মত দিয়েছেন। 'স্বাতন্ত্র্যবোধ ও জাতিবৈর' (১৯৬০) প্রবন্ধে 'নানা ধর্ম ও জাতি অধ্যুষিত এবং মতবাদ আকীর্ণ আজকের রাষ্ট্রে স্বাতন্ত্র্যবোধ ও জাতিবৈর গুরুতর অপরাধ' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তবে 'আজকের জাতীয়তা রাষ্ট্রভিত্তিক হতেই হবে' এমন মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক বিদ্যমান, কেননা রাষ্টকাঠামোর বারবার পরিবর্তনেও জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্য-উত্তরাধিকারে মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনা। ব্রিটিশ-ভারত পাকিস্তান অংশে নতুন কোনো মৌলিক ঐতিহ্য সৃষ্টি না করে বিভক্ত হলে তাকে পকিস্তানি জাতীয়তায় চিহ্নিত করার যৌক্তিকতা নেই। সম্ভবত আহমদ শরীফ এ-ক্ষেত্রে পাকিস্তানি পর্বে ধর্মের বহির্চাপটিকে রাষ্ট্র-ঢাল ব্যবহার করে প্রতিহত করতে চেয়েছেন। তিনি ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি ও স্বাতন্ত্র্য-সংকীর্ণতার বিপরীতে বৃহৎ শক্তি হিসাবে রাষ্ট্রকাঠামোকে গ্রহণ করেছেন। গোত্র, সম্প্রদায় রাষ্ট্রে অবলীন হলে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির সপক্ষে সক্রিয়তা দেখানো সহজতর হয় বলে যে ধারণাটি গড়ে উঠেছিল তাতে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্য অস্বীকার করা হয়েছে। রাষ্ট্রের অবাধ ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে দিয়ে দুটি মহাসমরের পর থেকেই জীর্ণ করা হয়েছে মানবীয় স্বাতন্ত্র্য ও মুক্তির দাবি। অবশ্য সমাজসচেতন আহমদ শরীফের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী কৌশলের এ-নেতিবাচকতার আশঙ্কা করিনা।[৩] তিনি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বিলোপ করে বৃহৎ বিশ্ব-ধারণা পোষণ করেন, ধর্ম ও গোত্রের গোঁড়ামিকেও তিনি অস্বীকার করেন, কেননা এতে বৃহত্তর মানবমুক্তির সন্ধান পাওয়া যাবে— যদিও এ বিশ্বাসে দুর্বলতা বিদ্যমান। তিনি মানুষের অগ্রগতি ও উন্নতি, শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য রাষ্ট্রীয় দৃঢ়তায় বিশ্বাসী—

> ক. এ যুগে রাষ্ট্রের দুর্বলতা ও সর্বনাশ যদি কোথাও লুকিয়ে থাকে তবে তা এই ধর্ম, গোত্র ও ঐতিহ্য প্রীতিপ্রসূত গোঁড়ামীর মধ্যেই। এতে অগ্রগতি ও উন্নতিও ব্যাহত হয়। ['ঐতিহ্যবোধ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র']

> খ. এ যুগের শান্তি ও নিরাপত্তা কোন বিশেষ গোত্রের গৌরব বোধে নেই, রয়েছে রাষ্ট্রভিত্তিক জাতি গড়ে তোলার মধ্যেই। ['ঐতিহ্যবোধ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র']

জাতি ও রাষ্ট্রের সম্পূরক সম্পর্ক সৃষ্টি করেই আহমদ শরীফ বিভ্রান্তির পরিচয় দিয়েছেন। একজন মানবতাবাদী হিসেবে মনুষ্যত্বের অন্তর্সত্য নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি প্রধান প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিত করলেও তাদের পরস্পরিক সম্পর্কের বহুকৌণিক মাত্রা নির্ণয়ে সমমনোযোগ দেননি। তিনি বিশ্বরাষ্ট্রের ধারণায় মানবজাতির সঠিক পরিচয় সম্পর্কেও প্রশ্নবিদ্ধ হলে যথার্থ হতো। সমকালে পাকিস্তানি রাষ্ট্রকাঠামোর প্রতিক্রিয়ায় তিনি স্বতঃস্ফূর্ত প্রত্যুত্তরে নিজেকে নিবিষ্ট রেখেছেন, দৃষ্টি প্রসারিত করে ধর্ম-সম্পর্কিত প্রত্যাঘাতে সামিল না হলেই ভাল হতো। ঘূর্ণাবর্তের মতো ধর্ম বিবেচনা ধ্যান-জ্ঞান হওয়াতে তা অতিক্রম করে নতুন সত্য উন্মোচনের পথটি অবারিত হয়নি। একটি পথ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য যে অটল অবিচল স্থিরতা প্রয়োজন আহমদ শরীফের সিংহভাগ প্রবন্ধে তার পরিচয় পাওয়া যায় না। 'ধর্মবুদ্ধির গোড়ার কথা' (১৯৬৩) প্রবন্ধে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দুর্বল মানবচিত্তে ধর্মের প্রোথিতমূল স্বরূপ চিহ্নিত করা হলেও 'জেহাদের স্বরূপ' প্রবন্ধে উগ্র-আক্রমণাত্মক রণনীতির পরিবর্তে আত্মশুদ্ধির পথে মুসলমানদের আহ্বান জানিয়ে একটা সমঝোতার প্রয়াস বিদ্যমান। অবশ্য ধর্ম ও রাষ্ট্র সম্পর্কে স্ববিরোধী কতিপয় মন্তব্যেরও তিনি জনক। 'দেশ, জাত ও ধর্ম' (১৯৬৩) প্রবন্ধে বলেছেন, 'আমরা একাধারে বাঙালি ও মুসলমান।' আবার পূর্ববর্তী রাষ্ট্রমতও খণ্ডন করেছেন—'মানুষের জীবন রূপ পায় মুখ্যত দেশ ও কালের প্রভাবে। ধর্মের প্রভাব খানিকটা কৃত্রিম। রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবোধ তো কৃত্রিম বটেই'। র্ধম প্রভাবযুক্ত কৃত্রিম রাষ্ট্রিক জাতীয়তা পরিত্যাগ করে আহমদ শরীফ শেষ পর্যন্ত বাঙালি জাতীয়তায় বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন :

> আমরা জাতে বাঙালী। আত্মবিকাশের সুযোগ পাব বলেই আমরা পাকিস্তান গড়েছি—আত্মবিলোপের জন্য নয়। আমরা বাঙালী থেকেই, বাঙালীত্ব রেখেই পাকিস্তানী। কেননা, বাঙালী হিসাবে বাঙলার আবহাওয়ায় বাঙালী জীবনের প্রসার লক্ষ্যেই পাকিস্তান চেয়েছি,— ইসলামের সেবার মহৎ উদ্দেশ্যেও নয়, ইসলামী সংস্কৃতির হাওয়াই সৌধ নির্মাণের স্বপ্নেও নয়।

স্পষ্টতই আহমদ শরীফ শেষ পর্যন্ত সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী। এই সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যই জাতি গঠনের ভিত্তি এবং পাকিস্তানি রাষ্ট্রের বিপরীতে বাঙালি জাতীয়তায় তিনি তাই বিশ্বস্ত। ধর্মকেন্দ্রিক সংস্কৃতিকে অস্বীকার করলেও বাঙালির ধর্ম ও ঐতিহ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন তার চিন্তাকে শেষ পর্যন্ত আকৃষ্ট করেছে। রাষ্ট্রের একক কর্তৃত্বকেও তিনি অস্বীকার করেছেন, সংস্কৃতিকেন্দ্রিক সৌন্দর্যানুগত্য যা জীবনসাধনার পরিণাম তাকেই আবাহন করেছেন। সকল সংস্কার বন্ধনের উর্ধ্বে যে মনুষ্যত্ব, তার উজ্জ্বল মুক্ত বিকাশ কামনা উদার মানবতাবাদী আহমদ শরিফের সংস্কৃতি চিন্তার ভিত্তি।

খ. সাহিত্য চিন্তা

সাহিত্যের অধ্যাপক আহমদ শরীফ তাত্ত্বিকতায় মৌলিকতার পরিচয় বহন না করলেও উচ্চারণের স্পষ্টতা ও সৎ সাহসিকতায় গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর 'সাহিত্যচিন্তা' উপশিরোনামায় বিভক্ত প্রবন্ধ-নিবন্ধ-গুলোতে সমকালীন মানসিকতার গতি-প্রকৃতিকে উদ্ধার করা যায়। পাকিস্তানি পর্বে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপর যে আঘাত এসেছিল তার প্রতিবাদ, প্রতিরোধে অন্যতম সৈনিক তিনি। জাতীয়তাবাদী আবেগ নিয়ে প্রশ্ন-মীমাংসা-প্রত্যুত্তরে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে বাধ্য হওয়ায়, গভীর সাহিত্যিক পর্যালোচনার স্বাক্ষর তাতে নেই—সাময়িকপত্রের জনবোধ্য ভাষায় সরল অভিব্যক্তি পেয়েছে প্রবন্ধগুলো। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরুতেই বাঙালির ভাষা স্বাতন্ত্র্যের উপর প্রথম আঘাত হানা হয়। কেবল একুশের রক্তক্ষয়ী সংঘাতেই তার মীমাংসা হয়নি, পাকিস্তানের শেষদিন পর্যন্ত ভাষা বিতর্ক ছিল চলমান। সংস্কৃতি চিন্তায় আহমদ শরীফ ভাষাকে যেমন জীবন-রস হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, এ-পর্বেও ব্যতিক্রম ঘটেনি। 'ভাষার কথা' (১৯৫৯) প্রবন্ধে ভাষা সৃষ্টিতে মানব-প্রযুক্তি ও ঐতিহাসিক বাস্তবতা স্বীকার করে তার সাবলীল রূপান্তরকে গ্রাহ্য করেছেন, কিন্তু আকস্মিক ও বহিরারোপিত দুরভিসন্ধিমূলক ভাষা পরিবর্তনের প্রচেষ্টাকে গ্রহণ করেননি। ভাষাকে ধর্মনিরপেক্ষ রাখার পক্ষেই তিনি মত দিয়েছেন। তাঁর মন্তব্য—

> বুতপরস্তের আরবী, আগুনপূজকের ফারসী এবং পৌত্তলিকের উর্দু যদি ইসলামী ভাষায় পরিণত হতে পারে, তবে সংখ্যা-গরিষ্ঠ বাঙালী মুসলমানের ভাষা অবিকৃতভাবেই ইসলামী হতে বাধা কি?

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইসলামিকরণের জন্য প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী তৎপর থেকেছে কিন্তু বাঙালির সাংস্কৃতিক দৃঢ়তা ও প্রাগ্রসর মানসিকতা তা হতে দেয়নি। হাজার বছরের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে এই উৎকট প্রচেষ্টা নস্যাতের জন্য যুক্তিতর্কে লিপ্ত হয়েছেন আহমদ শরীফ। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ইসলামি ধারা নামে যে ভাষা-সংস্কার ও ভাবসম্পদ নির্মাণের প্রচেষ্টা তার ব্যর্থতাকে তিনি উন্মোচন করতে চেয়েছেন। 'বাংলা সাহিত্যের ইসলামমুখী ধারা' (১৯৫২) প্রবন্ধে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সাধনার ফল হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। কোনো যুগেই নিরবচ্ছিন্ন ইসলামমুখী সাহিত্যধারার সন্ধান পাওয়া যায় না। মুসলিম রচিত সাহিত্যেও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর ভাবসম্পদ স্থান পেয়েছে, যেমন কোরআনের বঙ্গানুবাদ করেছেন একজন সনাতন ধর্মাবলম্বী। সমকালে কয়েকজন লেখক সচেতনভাবে ইসলামি সাহিত্য রচনার যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন তাকে গ্রহণযোগ্য মনে করেননি আহমদ শরীফ। প্রত্যেককে তিনি সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো না কোনোভাবে ব্যর্থ মনে করেছেন। আহমদ শরীফ মধ্যযুগের ইসলামি সাহিত্যকে ধর্মানুরাগজাত, নজরুলের সমাজবোধানুষঙ্গিক এবং তৎপরবর্তীকালে 'নিছক জাতীয়তা, সমাজবোধ ও আযাদী প্রেরণাপ্রসূত' সাহিত্য হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এ-সাহিত্যধারার শীর্ণস্রোতের অন্যতম কারণ হিসাবে সামাজিক মানুষের বাস্তবানুগত্যকে স্বীকার করেছেন। ভাষা প্রশ্নে ইসলামিকরণের

দৃষ্টান্তস্থল ছিল দোভাষী পুথি, কিন্তু আহমদ শরীফ তা স্বীকার করেননি। উদ্দেশ্যমূলকভাবে 'পুথিসাহিত্যের' ভাষাকে বাঙালি মুসলমানের ভাষা হিসাবে দাবি করার অযৌক্তিতা তুলে ধরেছেন 'দোভাষী পুথির ভাষা' (১৯৫২) এবং 'পুথি সাহিত্যের কথা' (১৯৫২) প্রবন্ধে। আহমদ শরীফ দোভাষী পুথি সৃষ্টিতে বাঙালির শিল্পপিপাসাকে স্বীকার করেননি, তিনি উর্দু-ফারসি ভাষীদের প্রয়োজনে এ-কৃত্রিম ভাষা-কৌশল ও গঠনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করেছেন।

> ক. খোট্টা বাঙালীর শহুরে বাঙলায় যে-সাহিত্য পলাশী যুদ্ধের পাঁচ-সাত বছর পর থেকে কলকাতা, হাওড়া, হুগলী ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে রচিত হতে থাকে, তার সাথে বাঙালীর কোনো যোগ ছিল না। ['দোভাষী পুথির ভাষা']
>
> খ. কৃত্রিম ভাষায় হালকা রচনার বিলাস করা চলে, কিন্তু সারবান মহিমময় সাহিত্য সৃষ্টি করা চলে না। অক্ষম লোকের কৃত্রিম ভাষা প্রয়োগের ফলে পুথি-সাহিত্য সৌন্দর্য ও শালীনতা হারিয়ে ফেলেছে। ['দোভাষী পুথির ভাষা']

আরোপিত ইসলামি মূল্যবোধকে অস্বীকার করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রকৃত উৎস ও গতি-প্রকৃতি অনুসন্ধানে উৎসাহী আহমদ শরীফ। সমকালে সাহিত্যের বস্তুবাদী ও ভাববাদী ধারা নিয়ে যে বিতর্ক প্রচল ছিল তাতেও তিনি অংশ নিয়েছেন, কিন্তু এ-ক্ষেত্রে তার কৃতিত্ব সামান্য। দ্বিধা-অতিক্রমী কোনো স্বচ্ছতায় তিনি উত্তীর্ণ হতে পারেননি। মূলত সাহিত্য-তাত্ত্বিকের মনোনিবেশ, বিশুদ্ধতায় শিল্পবিচার তাঁর প্রতিভার অনুকূল ছিলনা। অন্তত এর প্রমাণ পাওয়া যায় 'গণসাহিত্য' (১৯৫২), 'বুর্জোয়া সাহিত্য বনাম গণসাহিত্য' (১৯৫২) এবং 'কেজো ও অকেজো সাহিত্য' (১৯৬০) নামক প্রবন্ধত্রয়ে। মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্বে তিনি দীক্ষিত হলেও তার সপক্ষে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেননি এবং রসবিচারে দুর্বলতাও দৃষ্টিগ্রাহ্য। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি আদর্শনুগত্যকে গ্রহণ করেননি। গণসাহিত্য সম্পর্কে তাঁর ধারণাই অনেকাংশে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে বাধ্য। যেমন—

> ক. আদর্শানুগত্য জীবনের আর আর ক্ষেত্রে বিশেষ ফলপ্রসূ, কিন্তু মানসসৃষ্টির ক্ষেত্রে অভিশাপ। স্রষ্টা নিজেকে কোথাও বিকোতে পারেনা, তার স্বাধীনতা কারও কাছে বন্ধক রাখা যায় না। ['কেজো ও অকেজো সাহিত্য']
>
> খ বস্তুত গণ-সাহিত্যবাদী আর রস-সাহিত্যপন্থীদের উদ্দেশ্য এক এবং অভিন্ন—তা হচ্ছে জীবনকে নির্বিঘ্নে উপভোগ করা। ['বুর্জোয়া সহিত্য বনাম গণ-সাহিত্য']

পাকিস্তানিপর্বে সাহিত্যক্ষেত্রে রাষ্ট্রযন্ত্রের অনধিকার হস্তক্ষেপে বারবার চলমান সাহিত্যধারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। সংস্কৃতির গতিপথ রুদ্ধ করা এবং বাঙালির মননচর্চা স্তব্ধ করার জন্য কালো আইন জারি করেছে শাসকগোষ্ঠী। সংস্কৃতি-সেবী হিসাবে আহমদ শরীফ তার প্রতিবাদে নৈতিক ও জাতীয় দায়িত্ব

পালন করেছেন। 'সাহিত্যে আদর্শবাদ ও অর্ডিন্যান্স' (১৯৫২) প্রবন্ধে মত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতার পক্ষাবলম্বন করেছেন : "সাহিত্য-ক্ষেত্রে, যাঁরা বিধাতার আসনে বসে নির্দেশে ফরমায়েশি সাহিত্য সৃষ্টি করাতে চান, তাঁরা জাতির— বৃহত্তর অর্থে মানুষের—রসের ও উপলব্ধির ক্ষেত্রকে সংকীর্ণতর করে মনুষ্য সাধারণের সাংস্কৃতিক তথা মানবিক অধিকারকেই হরণ করছেন।" আহমদ শরীফের সাহিত্যচিন্তা সমাজ-ভাবনার অংশমাত্র এবং একটা মুক্ত সমাজব্যবস্থার জন্য ছিল তাঁর আমৃত্যু সংগ্রাম। সাহিত্য-সংস্কৃতিকে মানুষের মুক্তজীবন সাধনার পরিণাম হিসাবে বিবেচনা করে এ-ক্ষেত্রে ঐতিহ্যকেন্দ্রিক একটি সন্দর্ভ সৃষ্টিতে আগ্রহী আহমদ শরীফ। ধর্মশাসিত উৎকট সাহিত্যাদর্শকে তিনি ঐতিহ্য ও মানবিকতাপরিপন্থী বিবেচনা করেছেন। তিনি ভাষার কোনো ধর্মীয় রূপকে স্বীকার করেননি, যদিও ঐতিহ্যের দুটি রূপ স্বীকার করেছেন—'একটি দেশজ, অপরটি ধর্ম-বিশ্বাসপ্রসূত।' কিন্তু তিনি জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির জন্য জাতীয় ঐতিহ্যকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। 'সাহিত্যে রূপ-প্রতীক' (১৯৬০) প্রবন্ধে যারা 'বে-ইসলামী রূপপ্রতীক ব্যবহারের অনৌচিত্য সম্বন্ধে' প্রবন্ধ লেখেন তাদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেছেন— "আমরা যে ইসলাম ও ইসলামের উদ্ভব ভূমির দোহাই দিয়ে স্বাদেশিক ও স্বাজাতিক ঐতিহ্য ভুলে আরবের বিয়াবান ও বসোরাই গোলাবের দিকে তাকিয়ে থাকবার নসিহত জারি করতে চাই— এরূপ চিন্তা দুনিয়ার কোন জাগ্রত জাতি করে কি?" তিনি বাংলা সাহিত্যে মুসলিম উচ্চ ও মধ্যবিত্তের অবদান স্বীকার করেননি, কেননা তারা ভূমি-বিচ্যুত ছিলো। নিম্নবিত্তের অশিক্ষিত মানুষ মাটির মায়ায় পর-প্রভাব মুক্ত থেকে নিজ সাহিত্য রচনা করেছে। উচ্চবিত্ত বাঙালি 'মুসলিম' ও 'ইসলামী' সংস্কৃতির কূটতর্কে লিপ্ত হলেও আরব ও ইরানের মুসলিম সংস্কৃতি সম্পর্কে তারা উদ্দেশ্যমূলক নীরবতার আশ্রয় নেয়। সাহিত্য পৃথিবীর সকল ঐতিহ্যকেই গ্রহণ করতে পারে, তবে প্রধান আকর্ষণ দেশীয় ঐতিহ্যে থাকতে বাধ্য। এ-জন্যেই 'জাতীয় জীবনে লোক-সাহিত্যের মূল্য' (১৯৫৮) প্রবন্ধে বলেছেন—

> আধুনিক অর্থে আমরা জাতি হিসাবে আজো গড়ে ওঠার মুখে। এজন্যেই আমাদের কাছে এসব লোকশ্রুতি ও লোকসাহিত্যের মূল্য অপরিমেয়। এর থেকেই জাগবে আমাদের ঐতিহ্যবোধ। এখানেই দেখতে পাব আমরা আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ। আমাদের জাতীয় মন-মননের গতি-প্রকৃতির ও ক্রম-বিকাশের ধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও নিশ্চিত পরিচয় ঘটবে এসবের মাধ্যমেই। জাতীয় সাহিত্য যদি জাতীয় জাগরণের অবলম্বন হয়, সাহিত্যকে যদি জাতির প্রাণ রসের উৎস বলে মনে করি, তবে এগুলোর মূল্য অবশ্য স্বীকার্য।

আহমদ শরীফ প্রাণের আবেগে বাংলা সাহিত্যে বাঙালির ঐতিহ্য সন্ধান করেছেন। জাতিসত্তার ক্রমবিকাশ নির্ধারণে ভাষা ও সাহিত্যের অসাম্প্রদায়িক রূপটি তাঁকে সর্বাপেক্ষা আগ্রহী করেছে, সেখানে গণমানুষের প্রকৃত সামাজিক রূপটি খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি সাহিত্যকে মানুষের মনন ও

আবেগের স্বপ্নমুক্তি হিসাবে বিবেচনা করলেও তাকে সমাজ ও দেশজ ঐতিহ্যবন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী আহমদ শরীফ বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উপর পাকিস্তানপন্থী আক্রমণের প্রত্যুত্তেরে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন এবং তাঁর সাহিত্যচিন্তা তাই বাঙালির সংগ্রামী নিদর্শনের অন্তর্গত।

গ. সাহিত্যিক চিন্তা

আহমদ শরীফের সাহিত্য-সমালোচনার প্রধান ক্ষেত্র মধ্যযুগ। পুথিপাঠ, সমালোচনা ও সম্পাদনায় এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় বাংলাদেশে তিনি অনন্য। সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতির আলোচনায় তাঁর স্বভাবজ আগ্রহ ও তৃপ্তি এবং সাহিত্যের ইতিহাস রচনার নিষ্ঠা যেভাবে লক্ষণীয় স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে তা আধুনিক সাহিত্য সমালোচনায় অনুপস্থিত। তাঁর সামাজিক দায়বদ্ধতা ও আত্মমত প্রতিষ্ঠার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা প্রায়শ বিতর্কের জন্ম দিয়েছে, অবশ্য মতের পরিবর্তনও কালক্রমে ঘটেছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত সম্পর্কে দুটি প্রবন্ধ 'নতুন দৃষ্টিতে মধুসূদন' (১৯৬২) ও 'মধুসূদনের অন্তর্লোক' (১৯৬২); প্রথমোক্তটিতে যে নতুন দৃষ্টির মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে দ্বিতীয়টিতে তার অবসান ও মীমাংসা রচিত হয়েছে। আহমদ শরীফ যুগবৈশিষ্ট্যে মধুসূদনের মধ্যে যে দ্বিধা প্রাপ্তি ও প্রত্যাশার ব্যবধান, জাগতিক অর্থলোভ ও উদ্ধত স্বভাব, বিলাস ও ভোগে অসমন্বিত প্রতীচ্যমুখিনতা, ঔপনিবেশিক আলোকসজ্জায় আকর্ষণ ইত্যাদির সমালোচনা করেছেন। মধুসূদনে ইয়ংবেঙ্গলীয় ঐহিক জীবনবাদ ও পুরুষকারের মূর্তরূপ এবং তাঁর সৃষ্ট রাবণ চরিত্রে তারই প্রতিচ্ছবি; অবশ্য আহমদ শরীফ জানিয়েছেন, "কিন্তু এই পুরুষকারের মূল আত্মায় নয়, আত্মম্ভরিতায়। কেননা, পাশ্চাত্য জীবনবোধে ভূঁইফোড় মধুসূদনের চেতনায় পৌরুষ, ঐশ্বর্যগর্ব ও ভোগলিপ্সা স্থূল ও অমার্জিতই রয়ে গেছে, তাঁর জীবনে কিংবা কাব্যে তা সূক্ষ্ম ও পরিস্রুত রুচি বা রসবোধে পরিণত হয়নি বরং দাম্ভিকতায় তার প্রকাশ এবং হতবাঞ্ছার হাহাকারে ঘটেছে তার পরিণতি।" সত্যি যে মধুসূদনের ইউরোপীয় হওয়ার সাধনা ছিল; এই জীবনবোধের সঙ্গে রেনেসাঁসের একাংশের সম্পর্ক যেমন, বৈপরীত্য ততোধিক। অর্ধ-আলোকপ্রাপ্তির বিসদৃশ বোধ উনিশ শতকের প্রথমার্ধে উত্থানশীল পঙ্গুত্বের পরিণাম এনে দিয়েছে। মধুসূদনকে সেই মানদণ্ডে বিচার করলেই যথার্থ হতো, যা আহমদ শরীফ দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে করেছেন। উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে জীবনচেতনায় 'গ্রিক নিয়তিবাদের ও পুরুষকারের প্রভাব' অনিবার্য ছিল। যথার্থ বলেছেন "'আত্মবিলাপ' কবিতাটাই তাঁর আত্মজীবনী"। মহত্তম জীবনসাধনায় তাঁর অনুরাগ যা সমকালীন ভারত কিংবা ইউরোপে ছিলনা, কিন্তু রেনেসাঁসের জীবন-সৌন্দর্যও তিনি ধারণ করেছেন। ফলে তাঁর সাহিত্যের আঙ্গিক ও ভাবসম্পদে ক্লাসিক ও রোম্যান্টিকতার দ্বিধা অনিবার্য ছিল। শেষপর্যন্ত রেনেসাঁসের জাগ্রত রূপ নিয়ে "বাঙলার সমাজে ও সাহিত্যে, মননে ও মেজাজে মধূসূদনই প্রথম সার্থক বিদ্রোহী ও বিপ্লবী, পথিকৃৎ ও যুগস্রষ্টা।" মধূসূদন সম্পর্কে আহমদ শরীফের মনোভাব শেষপর্যন্ত ইতিবাচক হলেও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে তা ছিলনা। 'বঙ্কিম মানস' (১৯৬০) প্রবন্ধে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের ইউরোপীয় ও

ভারতীয় মনোভাবের দ্বিধা, উপযোগবাদ, সাম্যবাদ ও ধর্মতত্ত্বের সমালোচনা করেছেন। আহমদ শরীফ মনে করেন "বঙ্কিম সাহিত্য-প্রভাবিত বাঙলাতেই অখণ্ড জাতীয়তায় ফাটল ধরল।" তবে প্রতিভাসুলভ দূরদৃষ্টি বঙ্কিমের না থাকলেও সময়-সম্পৃক্ত জনমানসের প্রতিফলন তাঁর সাহিত্যে অনেকাংশে বিদ্যমান এবং সেই সূত্রে তিনি আহমদ শরীফের নিকট 'যুগসৃষ্টি, যুগধর ও যুগ-প্রতিভূ'।

রবীন্দ্রানুরাগী হিসাবে আহমদ শরীফ বিশিষ্ট, তবে স্বতঃস্ফূর্ত কিছু মন্তব্য বিতর্কও সৃষ্টি করেছে।[৪] পাকিস্তানিপর্বে যে রবীন্দ্র-বিতর্ক ও জন্মশতবার্ষিক অনুষ্ঠানের আন্দোলন তার অন্যতম সংগঠক ছিলেন আহমদ শরীফ। তাঁর জীবনসাধনা ও দর্শন চিন্তার অনেক সূত্রের কেন্দ্রমূলে অবস্থান করে রবীন্দ্র-প্রভাব। ১৯৫২ সালে রচনা করেছেন 'অতীন্দ্রিয়লোকে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটি। এ-প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের শেষ পর্বের কাব্যের আলোচনা স্থান পেয়েছে। আহমদ শরীফ রবীন্দ্রনাথের শেষপর্বের কাব্যে অতীন্দ্রিয়লোকের সন্ধান পেয়েছেন যা রবীন্দ্রজীবনে জীবন-মৃত্যুর মধ্যবর্তী ভূমি ও ভূমার অনুভূতির সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে। প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ অনুভাবক কিন্তু শেষ জীবনে হলেন দ্রষ্টা; অনুভূতির স্থান দখল করেছে প্রজ্ঞাদৃষ্টি ও উপলব্ধি। 'জন্মদিন', 'রোগশয্যায়' ও 'আরোগ্য' কাব্যগ্রন্থের কবিতাবলি আলোচনা করে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন এ-পর্বে "চিত্তের চাইতে চিন্তা, আবেগ ছাপিয়ে উদ্বেগ, মনের উপরে মস্তিষ্ক, ভাবের চেয়ে ভাবনা, প্রাণ থেকে প্রজ্ঞা প্রবল হয়েছে।" এ-পর্বে তিনি বক্তা ও বেত্তা, মুখ্যত মনীষী আর গৌণত কবি। ১৯৬১ সালে লিখিত 'রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আহমদ শরীফের শ্রদ্ধাবনত চিত্তের প্রকাশই মুখ্য। রবীন্দ্রবিতর্কে জড়িয়ে বাঙালির আত্মোপলব্ধির প্রকাশ হিসাবেও প্রবন্ধটিকে বিবেচনা করা যায়। তিনি রবীন্দ্রনাথকে আলো-বাতাসের মতোই অনিবার্য ও আত্মীয়ের ঘনিষ্ঠতায় স্থান দিতে আগ্রহী, কেননা "তিনি আমাদের ভাষা দিয়েছেন, কথা যুগিয়েছেন।" আহমদ শরীফ তাঁর ব্যক্তিগতজীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রকাশ নিঃসংশয়ে স্বীকার করেছেন এবং জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে জানিয়েছেন, "যে সে-প্রসাদ নিতে জানলনা, সে বদ্‌নসিব, যে পারল না, তার দুর্ভাগ্য।" রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যতোটা ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও বিস্ময়মুগ্ধতা ধ্বনিত হয়েছে সে মাত্রায় বিশ্লেষণ-গভীরতা আহমদ শরীফের প্রবন্ধে পাওয়া যায় না। ১৯৬৭ সালে লিখিত 'সৌন্দর্যবুদ্ধি ও রবীন্দ্রমনীষা' ও 'রবীন্দ্র-মানসের স্বরূপ সন্ধানে' প্রবন্ধে সর্বাস্তিবাদ, প্রকৃতিকেন্দ্রিক ঐক্যানুভূতি ও বৈচিত্র্যে ঐক্য-তত্ত্ব এবং মানব মহিমা-সূত্রের স্বরূপ আলোচনা করেছেন। সামন্ত অবক্ষয় ও বুর্জোয়া জাগরণের সন্ধিক্ষণে বেড়ে ওঠা রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দর্শন-চিন্তার সারাৎসার গ্রহণ করেই নিজস্ব জীবনদর্শন গড়ে তুলেছেন। বিশ্বমানবের অদ্বয় সত্তার ধারণা তাঁর প্রকৃতিকেন্দ্রিক, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঔপনিষদিক বিশ্বাত্মবাদ, বৌদ্ধ করুণা ও মৈত্রীতত্ত্ব, সন্ত-বাউলের প্রীতি ও অধ্যাত্মজিজ্ঞাসা। ফলে তাঁর মানবজিজ্ঞাসায় কোথাও ভেদ-বুদ্ধি নেই। "মানুষের ধর্ম বলতে তিনি বুঝিয়েছেন মানুষের চিত্তোত্থিত কল্যাণবুদ্ধি ও আত্মাজপ্রীতি" এবং "এচিন্তা থেকেই তাঁর স্বাদেশিকতা বিশ্বচিন্তায় এবং তাঁর জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতায় পরিণত, আর ব্রহ্মাচর্যাশ্রম বিশ্বভারতীতে উন্নীত।" রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আহমদ শরীফের শেষ মূল্যায়ন : "এযুগে রবীন্দ্রনাথ

আমাদের চোখে প্রাচ্যের মহত্তম প্রতিভা, শ্রেষ্ঠ মনীষী, প্রতীচ্য আত্মার দূত, আধুনিকতার বাণীবাহক, মানবতা, মানবিকতা ও বিশ্বজনীনতার উদ্‌গাতা যুগন্ধর ও যুগস্রষ্টা।" ['রবীন্দ্রমানসের স্বরূপ সন্ধানে']

আহমদ শরীফ, নজরুল ইসলামকে রবীন্দ্রনাথের মতো ভক্তিভাবে গ্রহণ করেননি। সমকালে নজরুল-প্রীতির আধিক্য তাঁকে সম্ভবত প্রতিরোধপন্থী করে তুলেছে। নজরুল-আলোচনায় ধর্মীয় আবেগ ও ভাবালুতাকে পরিত্যাগ করে যুক্তির কষ্টিপাথরে ঐতিহাসিক অবস্থান নির্ণয়ে তাঁর ভূমিকা অনন্য।[৫] নজরুলকে ইসলামি কবি হিসাবে চিহ্নিত করার যে প্রয়াস পাকিস্তানিপর্বের শুরু থেকেই সক্রিয় হয় তার প্রত্যুত্তর ধ্বনিত হয়েছে 'নজরুল ইসলামের ধর্ম' (১৯৫২) প্রবন্ধে। আহমদ শরীফ নজরুলকে মানবতাবাদী হিসাবে চিহ্নিত করতে সচেষ্ট; মানুষই তাঁর ধর্ম এবং মানবপ্রেমই তাঁকে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা থেকে রক্ষা করেছে। নজরুলের ইসলামপ্রীতি ধার্মিকতাপ্রসূত নয়, মানবতা ও ব্যক্তিনিষ্ঠাজাত। তাতে আদর্শানুগত্য বিদ্যমান থাকলেও ধর্মপ্রাণতা নেই। এজন্যেই "নজরুলের ধর্মবোধ স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি জাগায় না। এধর্ম কল্যাণ ও মিলনকামী।" ১৯৫২ সালে লিখিত 'নজরুলের কাব্য প্রেরণার উৎস' ও 'নজরুলের কাব্য সাধনার লক্ষ্য' প্রবন্ধে নজরুলের সংবেদনশীল কবিচিত্তে সমকালীন সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় দাসত্ব, দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও শাসন-শোষণের ভয়াবহতা যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে তার স্বরূপ ব্যাখ্যায় আগ্রহী আহমদ শরীফ। নজরুলের তীব্র আবেগ, স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি ভালোবাসাই তাঁর কাব্যের উৎস, পৃথিবীর সকল নির্যাতিতের সঙ্গে আত্মিক বন্ধন অনুভবের মধ্যেই তাঁর কাব্যের প্রাণশক্তি। নির্যাতিতের প্রতি সমবেদনা ও তার উদ্ধারের জন্য শক্তিপ্রয়োগ ও রক্তপাত তাঁর আদর্শ। তাঁর বিদ্রোহ, বিপ্লব ও সাম্যবাদে সচেতন আদর্শানুগত্য নেই, প্রাণের আবেগ ও মানববোধই তার উৎস। সাম্যবাদে সে শ্রেণী বিলোপের ধারণা তার সম্পর্কেও নজরুল স্বচ্ছতায় পৌঁছেননি, তবে মানুষের জন্য সমবেদনা তার ব্যক্তিত্বেরও উৎস। নজরুলের কাব্যসাধনার লক্ষ্য সম্পর্কে আহমদ শরীফ জানিয়েছেন : "বিত্ত-বৃত্তি নিরপেক্ষ মানুষের যে ব্যক্তি সত্তা, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তির আত্মিক মর্যাদা আছে, সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে এ স্বীকৃতি আদায় করাই ছিল তার কাব্য সাধনার লক্ষ্য। তিনি চেয়েছিলেন মনুষ্যত্বের অবাধ স্ফুরণ ও বিকাশের অধিকার। তিনি স্বপ্ন দেখেছেন মানুষ নির্বিশেষে অবাধ ও সহজ মিলনের; যে-মিলনে বিত্ত-বৃত্তি-বেশাত বাধা হয়ে দাঁড়ায় না, যে মিলন সম্ভব হয় পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদার স্বীকৃতির উপর। তিনি চেয়েছেন এমন 'মিলন ময়দান' যেখানে মনুষ্যত্ব ও মনুষ্যাত্মা লাঞ্ছিত হয়না এবং 'যেখানে আসিয়া সমবেদনায় সকলে হয়েছে ভাই।" সুনির্দিষ্ট দর্শন ও সমাজগড়ার পরিকল্পনার অভাব নজরুল কাব্যের অন্যতম দুর্বলতা হিসাবে চিহ্নিত করলেও আহমদ শরীফ নজরুলের জাতীয়তাবোধের প্রশংসা করেছেন। অসাম্প্রদায়িক জাতীয় চেতনার ধারক নজরুল 'বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর ভারতে ধর্মীয় পরিচয় গৌণ করে' 'দেশগত জাতীয়তাবাদ প্রচারকে' জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। আহমদ শরীফ 'নজরুল মানস' (১৯৬১) প্রবন্ধে সেই জীবনদর্শনের সপক্ষে সমকালে নজরুলের উপযোগিতা স্বীকার করেন :

> যে-জন্য নজরুলের সংগ্রাম, তা আজো আমাদের দৃষ্টি-সীমার বাইরে। নজরুলেরই সংকল্প—'আমি প্রেম দিতে এসেছিলাম, প্রেম পেতে এসেছিলাম'— গণমানসে সংক্রামিত হোক।

নজরুল আলোচনায় আহমদ শরীফ উপযোগবাদী। নজরুলের মুসলিম স্বাতন্ত্র্য নিয়ে সমকালে যে অনাকাঙ্ক্ষিত আবেগ বাহুল্য তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী রূপটি তাঁর প্রবন্ধে স্পষ্ট। নজরুলের অসাম্পদায়িক রূপ, তাঁর প্রাণধর্মের শক্তিবিশৃঙ্খলা ও প্রতিভার অপচয়ের বিবেচনা যুক্তিসহ সমাজমানসে প্রতিষ্ঠা করাই আহমদ শরীফের উদ্দেশ্য। পাকিস্তানি মতাদর্শের সঙ্গে নজরুলের মানসিকতার গুরুতর পার্থক্য বিদ্যমান তার স্পষ্ট উচ্চারণ আছে 'নজরুল ইসলাম : এক বিরূপ পাঠকের দৃষ্টিতে' প্রবন্ধে :

> ক. আমাদের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে আমরা নজরুলকে জাতীয় কবি বলে প্রচার করি। অন্যত্র যেমনই হোক, সুধী-সভায় তাঁকে জাতীয় কবি বলে পরিচিত করাবার চেষ্টা অনুচিত কর্ম। কেননা, 'জাতীয় কবি'র যে সংজ্ঞা আমাদের জানা আছে, তাতে তিনি পাকিস্তানের জাতীয় কবি হতে পারেন না। সংগ্রামী আদর্শেও না, বোধেও না।
>
> খ. জীবন চর্যায় নজরুলে মুসলমানী যতটুকু আছে, হিন্দুয়ানী আছে তার চেয়েও বেশী। তিনি মুসলিম জাতীয়তায় বিশ্বাস রাখেননি। তাঁর আস্থা ছিল হিন্দু-মুসলিম জাতীয়তায়। রবীন্দ্রনাথ তবু মুসলমানদের স্বতন্ত্র স্বার্থ স্বীকার করেছেন, নজরুল তাও করেননি। রবীন্দ্রনাথকে ত্যাগ করতে হলে নজরুলকেও রাখা চলেনা।

আহমদ শরীফ নজরুল-প্রীতির ধর্মকেন্দ্রিক মোহমায়াজাল ছিন্ন করতে আগ্রহী। যুক্তির বিন্যাসে নজরুলের উপযোগিতা যে অসাম্প্রদায়িক জাতীয় চেতনায় এবং তিনি যে রবীন্দ্রনাথের চাইতেও অধিক মাত্রায় ধর্ম সম্প্রদায় বিলোপপন্থী তা প্রমাণ করতে চেয়েছেন আহমদ শরীফ। সকল ধর্মীয় সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত নজরুলকেই আহমদ শরীফ সানন্দে গ্রহণ করেছেন কিন্তু 'মহাকবি কায়কোবাদ' (১৯৫১) প্রবন্ধে ইসলাম-অনুসারী কবি কায়কোবাদকে একটি যুগের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আশ্রয় নেয়ার রূপক হিসাবে গ্রহণ করেছেন। অসাম্প্রদায়িকতার কারণেই 'লালন শাহ' প্রবন্ধে লালনের জীবন ও বাউলতত্ত্ব ইতিবাচক প্রাণের আবেগে আলোচিত।

আহমদ শরীফ সমকালীন সমাজ-সংস্কৃতি ও সাহিত্যভাবনায় ব্যক্তিত্বের স্বতঃস্ফূর্ততায় সম্পৃক্ত হয়েছেন। পাকিস্তান-পর্বে বাঙালি সংস্কৃতির প্রতিকূল সকল রাষ্ট্রীয় কিংবা দুরভিসন্ধিমূলক গোষ্ঠীবৃত্তির বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ ও প্রতিবাদ প্রকাশ করেছেন একজন অঙ্গাঙ্গী বুদ্ধিজীবী হিসাবে। ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে যে বিতর্ক, সংস্কৃতির ইসলামিকরণের যে অপচেষ্টা, রাষ্ট্রযন্ত্রের যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব তার বিরুদ্ধে আহমদ শরীফ প্রতিবাদী লেখনীর মাধ্যমে বাঙালির সাহিত্য-সংস্কৃতি ও জাতীয়তার

সপক্ষকর্মী। তাঁর প্রতিভার শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক মনোযোগ সর্বাংশে ব্যয় হয়েছে প্রতিবাদ ও প্রত্যুত্তরে এবং স্বাধীনতার তিনদশক পরেও *বিচিত চিন্তায়* বাঙালির যে সংগ্রামী মনোভাব তা অপ্রাসঙ্গিক হয়নি।

তথ্যনির্দেশ

১. *বিচিত চিন্তা* প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সালে। তবে বর্তমান আলোচনার পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে এ গ্রন্থের দ্বিতীয় মুদ্রণ (১৯৭৫) থেকে। গ্রন্থের পরিবেশক চৌধুরী পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।

২. বর্তমান প্রবন্ধে *বিচিত চিন্তার* প্রবন্ধগুলোর প্রকাশ ও রচনার সন গ্রহণ করা হয়েছে আগামী প্রকাশনীর ২০০০ সালে প্রকাশিত, আহমদ কবির ও আবুল হাসনাত সম্পাদিত *আহমদ শরীফ রচনাবলী-১* গ্রন্থের 'গ্রন্থপরিচিতি' অধ্যায় থেকে।

৩. সমাজতন্ত্র কমিউনিজমে উত্তীর্ণ হলে রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রথাগত রূপটি বিলুপ্ত হবে এমন ধারণা মার্কসবাদীদের অবশ্য সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাপর্বে রাষ্ট্রযন্ত্র কেন্দ্রীয় শক্তিতে পরিণত হয়। অবশ্য উত্তর-আধুনিক পর্বে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার উত্তেজনা সৃষ্টি করে নৃ-তাত্ত্বিক অন্তর্কলহ সৃষ্টির অপচেষ্টা বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। আহমদ শরীফ উভয় উদ্দেশ্য থেকে দূরে ছিলেন।

৪. সমগ্র পাকিস্তান পর্বে আহমদ শরীফ ছিলেন প্রকাশিত রবীন্দ্রভক্ত, রবীন্দ্রসাহিত্য প্রচার ও প্রসারের পুরোধা ব্যক্তি। কিন্তু স্বাধীনতার পর রবীন্দ্রনাথকে 'ঐতিহ্য' হিসাবে স্বীকার করলেও 'সম্পদ' বলতে রাজি হননি। সম্ভবত মার্কসবাদী বিভ্রান্তিকর আবহ তাঁকে স্পর্শ করেছিল।

৫. নজরুল সম্পর্কে আহমদ শরীফের মতামতে আমৃত্যু মাত্রাগত মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। পাকিস্তান পর্বে তাঁর স্থায়িত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করলেও ১৯৮৫-৮৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নজরুল অধ্যাপক হিসাবে বক্তৃতামালায় স্বভাবতই তা খণ্ডিত হয়ে যায়।